আক্রোশ

ইন্দু সাহা

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রসঙ্গে

ঘটনার সবটাই কাকতালীয় নয়। হলে আমি অন্তত এই উপন্যাস লিখতুম না। আর কোনোদিনও আমি সেইসব নির্বীর্যদের গোত্রভুক্ত নই, যাঁরা ছদ্মনামে মুখোশে মুখ লুকিয়ে তাদের মনের কথা অংশত প্রকাশ করেন।

ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলসের একটা কথা আমি খুব মেনে চলি। তিনি বলেন, সমাজের চালচিত্রের যা বাস্তবতা, লেখকের কর্তব্য তার অনুপুঙ্খ প্রকাশ করা। মূলত তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রকৃত সত্যকে যদি লেখকেরা তুলে ধরেন তো সেই প্রেক্ষিত থেকে জনগণই তাঁদের কর্তব্যকর্ম বেছে নেবেন। সামগ্রিকভাবে বুঝেই তা বেছে নেবেন।

প্রকৃত কথাটি এই।

এই উপন্যাসের মর্মমূলে আছে চরমতম কষ্ট, গ্লানি, অসম্মান, পীড়ন আর যৌনগ্রাসের, রিরংসার মত্ততা। চোখের জলের। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের! আর তার জন্য একটি পরিবারের মুখ হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় চালচিত্রের মুখ।

আমাকে নির্মম হতে হয়েছে। কোথাও নিষ্ঠুরও। এখানে 'দুঃসাহসী' কথাটি গৌণ। কোনো ভণ্ডামির প্রয়াসে আমি নিজেকে বাঁধতে চাইনি। চাইনি আড়াল করতে। বহুদিনব্যাপী এই উপন্যাসের চরিত্রেরা আমাকে তাড়িয়ে ফিরেছে। কিছুতেই তাদের হাত থেকে পালাতে পারিনি।

অবশেষে এই উপন্যাস না লিখে পরিত্রাণ পেলাম না।

আর সেক্স?

হ্যাঁ সেক্স তো এসেইছে। পৃথিবীর কোনো ধ্রুপদী সাহিত্যে এরকম জীবন্ত, তাজা, স্নায়ুবিচলিত সেক্স আসেনি। এমনকি ডি.এইচ. লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লিস লাভার' উপন্যাসেও নয়। এই উপন্যাসের চরিত্রদের যা প্রেক্ষা, সেই প্রেক্ষাকেই আমি নগ্ন করেছি। নগ্ন না হলে তো শুদ্ধতার বসনে নতুনকে আবৃত করা যায় না।

ঢাকা ছেড়ে আসবার পরে বহুবছর আমি বড়ো কোনো লেখায় হাত দিতে পারিনি। পেছনে তার অনেক কারণ। কখনো সুযোগ এলে সে মুখোশও ছিঁড়ে দেব।

এই শুরু তাই শূন্য থেকে শুরু।

শূন্যের সারসত্য অভিধা 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'।

সেই অনন্ত অন্তহীন 'ব্রহ্মাণ্ডে'র কতটুকুই বা জানা যায়? প্রকাশই বা করা যায় কতটুকু? তবুও আমি এবংবিধ প্রেক্ষাপটে কিছু মহাপ্রলয়ের প্রেক্ষা নিয়ে লিখতে শুরু করেছি। আর অবিশ্রান্তভাবে তা না লিখে গেলে অনিবার্য হয়ে ওঠে লেখকের মৃত্যু। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হবে কি ? জানি, তা হবে না। আমাকে যাদের অবিশ্রান্ত নিন্দামন্দ করার তারা তারা তা করুন।

'অশ্লীলতা' 'প্রগতিশীলতা' নিয়ে তুমুল বিতর্ক হোক। প্রগতিশীলতার নামে কেন সত্যকে ঢেকে রাখব? কেন করব আড়াল? এসব নপুংসকদের কাজ।

আমি অকুতোভয়। আমাকে নিষিদ্ধ করা হোক। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সেই নিষিদ্ধতাকে আমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে জানি।

উপসংহারে বলতে চাই, যে যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে তার যা দায়, তার অনুপুঙ্খ প্রকাশের নামই ইতিহাস।

অভিনন্দন তাদেরকে, যারা এই উপন্যাসের সঙ্গে নিজেদের অনুভবকে মিলিয়ে সঠিক যোগফল কষবেন। যোগফল নির্ভুল প্রমাণিত হবে আবারও।

বইমেলা, ২০০৫

আশ্চর্য এই যে, দৃঢ় মুষ্ঠিতে তার রজনীগন্ধার ডাঁটা! হ্যাঁ, রজনীগন্ধা!

মাটি ছুঁই ছুঁই দুটি পা। ছেঁড়া ফ্রক। নিষিদ্ধ বক্ষপিঞ্জরের নীচে ঝুলে আছে সেই ফ্রক।

দৃশ্যটার বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়, কুলগাছ থেকে একটা অতিকায় ধবধবে ফুল ঝুলে আছে। ফুল কি কখনো অত বড়ো হয়? সে বিতর্ক এখানে অচল। অপ্রয়োজন।

গঙ্গাদাসপুরের এই কুলগাছটাকে ঘিরেই তো দৃশ্যটা জমাট হয়ে উঠেছে।

না। ওটা ফুল নয়। ফুটফুটে এক কিশোরীর মৃতদেহ। ফুলের মতো। রজনীগন্ধার মতো।

হইহই করে মানুষ আসছে। আসছেই। বাজার থেকে। তিন মোহনা থেকে। দয়ারাম থেকে। আত্রাই নদীর ওপার থেকে।

এপার থেকে।

মাথা কুটে কাঁদছেন এক বৃদ্ধা। কিশোরীর বিধবা মা। মাটিতে দুই হাত চাপড়ে কাঁদছেন। বেলা বাড়ছে। মানুষও বাড়ছে।

খুন!

খুন করা হয়েছে।

না! না! আত্মহত্যা।

কিছুতেই আত্মহত্যা নয়।

ফাঁসিতে ঝুলিয়ে প্রমাণ করা হচ্ছে আত্মহত্যা।

থানায় খবর পাঠাও।

পিনাকী কোথায়?

পিনাকী জেলে।

আজ আটমাস।

উত্তেজনা বাড়ে।

দেখ। তোমরা দেখ।

কিশোরীর পেট দেখ।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। দেখেছি।

মাতৃত্বের সুস্পষ্ট আভাস।

কে?

কে সেই লম্পট?

আকুল হয়ে কাঁদছেন বৃদ্ধা। কাঁদছে দুই বোন। বুকফাটা আর্ত কলকোলাহল।

বেলা বেড়ে যায়। উত্তেজনা বাড়ে। পুলিশ কেন আসে না।

আসবে কেন তাড়াহুড়ো করে ওরা? গরিবের লাশ যে!

অনেক জিরিয়ে সাতিয়ে তারপর পুলিশ আসে।

যা হোক। এসেছেন সাহেবরা।

এসেই হাঁকডাক। হট্ যাও। হট্ যাও। লাশমে হাত মৎ লাগাও। বলতে বলতে ভিড়ের দিকে তেড়ে যায় ওরা।

রোদের তেজ বাড়ে।

লাশ ততক্ষণে ঝুলতে ঝুলতে মাটি ছুঁই ছুঁই। মাটির টান বুঝি।

হাওয়ায় দুলছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ। জিভ। খোলা বুকে শুকনো রক্ত। কালো জমাট।

বীভৎস।

সেই বীভৎসতা ছায়া হয়ে হাইরোড ধরে ছুটে যায় শহরের দিকে। খবর পৌঁছয় মহাভারত বিশারদের কাছে। আর সেই ছায়া ধরে আমি এইভাবে মহাভারতের পাতা মেলে ধরি। অস্পষ্ট। ধূসর। ছায়াবৃত। সেই ছায়া দেবদারুর মতো ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে যায়। প্রাচীন শ্যাওলার গন্ধ পাই। সোঁদা গন্ধ।

চারিদিকে লাল মাটি। কোথাও পিঙ্গল। দো-আঁশ। বিষ্টি হলে দারুণ পিচ্ছিল হয়ে যায়। দেহাতি মানুষ কাজ করে মাঠে মাঠে। নিজেদের ভাষায় কথা বলে। কোদাল চালায়। রাস্তা নির্মাণ করে। জঙ্গল কেটে সভ্যতার আধুনিকীকরণে দেহাতি মানুষের রক্ত, ঘাম মিশে যায় কালো মৃত্তিকার বুকে।

ইটের পরে ইট। সিমেন্ট, বালি, খোয়া, পাথরের কুঁচিতে কংক্রিট হয়ে যায় মেঝে। ছাদ। বারান্দা। দেওয়াল।

নকশা হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন শমীক রায়।

কালীবাবু কফি আনেন।

বসবার অবসর নেই।

গ্রীষ্ম পার হয়ে যায়।

শীত ফুরিয়ে যায়।

কফির পেয়ালায় ধোঁয়া ওঠে।

জুনিয়র হাইস্কুলের টিনের বেড়া হারিয়ে যায়। ভাঙা জানলায় সুন্দরী কাঠের নকশা-করা ফ্রেম লাগানো হয়।

চারিদিকে সৃষ্টির কলরব।

সুতপা রায় ছুটে আসেন জেলাশহর 'রায়া' থেকে। এসে ব্যাকুলভাবে বলেন, তুমি তো মানুষ। এতটা কেউ করে? বলবে! আজ দু'সপ্তাহ তুমি বাড়ি যাও না!

শুনে তিনি উদাস কণ্ঠে বলেন — কাজটা শেষ করতে দাও। বাড়ি আমার আমেরিকায়

চলে যাচ্ছে না।

আমি তা বলিনি। সুতপা রায় অনুনয় করেন, একবারটি চলো।

এখন আমার বাড়ি যাওয়া চলে না। এখানে আমার স্বপ্নের শেকড়।

তা হোক। তা বলে শরীর দেখবে না? আহত কণ্ঠে বলেন সুতপা।

মাথা নাড়েন টুকটুকে ফর্সা শমীক রায়। বলেন, শরীর ঠিক আছে। কালীবাবু ছায়ার মতো লেগে আছেন আমার পেছনে। খাওয়া-দাওয়া সবই নিয়ম করে হচ্ছে। বিশ্রামও নিচ্ছি। কোনো অসুবিধে নেই আমার। বলে সুতপাকে দেখেন। হেসে বলেন, এতবড়ো একটা কাজ। প্রায় হয়ে এসেছে। আর মাত্র মাস চারেক।

আরও চারমাস তুমি বাড়ি যাবে না?

না।

সুতপা অসন্তুষ্ট হন। গায়ে মাখেন না শমীক রায়। আর এইভাবে প্রতিদিন তার কাজ এগোয়। সেইসঙ্গে বাগানের পরিচর্যা। স্কুলও হবে। বেড়ে উঠবে বাগানও।

মংলা সাঁওতাল বাগানে ফুল ফোটায়। কী তার শোভা। চাঁদের আলোর মতো স্বপ্ন-স্বপ্ন। কুসুম-কুসুম সুবাস। হিম হিম ছায়া।

আমগাছটা কাটা যাবে না। লিচুগাছটাও থাকবে। খুব মিষ্টি ফল। থাকলে ছেলেরাই খাবে। ওদেরই তো জিনিস। সবদিকে নজর তার। ওই যে, ওই কার্নিশের ধারে ঠিকমতো পালিশ হয়নি। কর্ণি দিয়ে মেরে দাও আর একটু। সেই নির্দেশে কর্ণি চলে। দেহাতি মেয়েরা মাটি বয়ে আনে। কাশবনের পেছনের ডোবাটা ওইরকমই থাক। ওখানে পুকুর হবে। জল নাচিয়ে মাছেরা খেলবে সেই পুকুরে। এই যে! এই মেয়েরা! পাড় ঘেঁষে মাটি ফেল। আরো উঁচু হবে।

এই যে! আপনি আরো চারজন রড বাইন্ডার নিয়ে আসবেন। পিলারের ফ্রেমগুলো আরো মজবুত করে বানাতে হবে।

এই যে কালীবাবু! খোয়া-টোয়া চুরি যাচ্ছে না তো? চোখে চোখে রাখবেন। ঘুমটুম পরে হবে। আগে স্কুলটা হয়ে যাক।

কালীবাবু ভয়ে ভয়ে বলেন, স্যার! দুপুরের রোদে পুড়ে যাচ্ছেন যে! একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন স্যার!

শুনে বড়ো বড়ো চোখ পাকিয়ে তাকান শমীক রায়। ভয়ে পালিয়ে বাঁচেন কালীবাবু। অনেকক্ষণ তার পাত্তা পাওয়া যায় না।

আবার একসময় এসে বলে — স্যার! খাবার দিচ্ছি।

নির্বিকারভাবে শমীক রায় বলেন, ঢাকা দিয়ে রাখুন।

ঠান্ডা হয়ে যাবে।

হোক। স্কুল আগে।

খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে চলে আসেন ফের সুতপা। বলেন, কতদিন হয়ে গেল। মেয়েটা কাঁদে। আজ একবার ঘুরে আসবে, চল।

অসম্ভব। আমি গেলেই এখানে ফাঁকিবাজি হবে। তুমি যাও।

মন খারাপ করে ফিরে যান সুতপা।

তো এর মধ্যে মহাভারতের কথা কেন? মহাভারতের কথা আমদানি করেন কালীবাবু। শমীক রায় যখন সন্ধের পরে বিশ্রাম নেন, তখন দেহাতিদের গনগনে চুল্লির পাশে বসে মহাভারতের অর্জুনের কথা বলেন। যেন মহাভারতের অর্জুনকে তিনি নিজে দেখেছেন। তেমনি করেই বলেন, বিশ্বাস করছিস নে?

হয়। হয়। বিশ্বাস লাগে তো। তু বল না ক্যানে।

শুনে কালীবাবুর বলার উৎসাহ বেড়ে যায়। শমীক রায় এই স্কুলের তরুণ হেডমাস্টার। তিনি কালীবাবুর চোখে অর্জুন। বলেন, দেখিস না, কীরকম চোখ, টানা টানা ভুরু। আর গায়ের রং দেখেছিস? সিঁদুরে আম। তোরা তো মহাভারত পড়িসনি। ঠিক বুঝবিনে। তা বলে মহাভারতে অর্জুন ছাড়া আর কেউ পুরুষ নেই? ঢের ঢের পুরুষ আছে। কোটি কোটি। কিন্তু অর্জুনের মতো কেউ নয়। এই যে আমাদের স্কুলের কত টিচার রয়েছেন, কত সাহেব-সুবো আসছেন, স্যারের মতো কেউ নয়।

হয়। হয়। সি কথা ঠিক বটে।

এইভাবে কাজ চলে।

ভরদুপুরে সবাইকে দেখিয়ে কালীবাবু হেসেই অস্থির। বলেন, মংলা সাঁওতালটার কাণ্ডটা একবার দেখ্ তোরা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে কীরকম মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে শরীর সেঁকছে! বলি গাধা কি আর গাছে ধরে?

না। গাধা মাটিতে ধরে। পেছন থেকে গম্ভীর জবাব শমীক রায়ের।

কালীবাবু থতমত খেয়ে ছুট দেন।

পেছনে দাঁড়িয়ে তার পালানো দেখে নিঃশব্দে হাসেন শমীক রায়। তারপর হাঁক দেন, এই যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

য়্যাঁ স্যার।

মিক্সচারটা ঠিক হচ্ছে কিনা দেখছেন তো?

হচ্ছে স্যার।

এই যে ঠিকেদার সাহেব।

এই তো স্যার।

আপনার সম্পর্কে অভিযোগ আছে।

অভিযোগ?

তাই তো বলছি। দিনেরবেলায় ড্রাঙ্ক থাকেন কেন?

রোদে রোদে থাকতে হয় স্যার।

আমিও তো রোদে রোদেই আছি।

তা ঠিক। তবে ওটা আমাদের ওভ্যেস হয়ে গেছে।

ওভ্যেসটা এবার বদলান।

আর স্যার ...। থেমে গেলেন ঠিকেদার সাহেব।

থেমে গেলেন কেন? আপনার টেন্টে মেয়েছেলে আসে কেন রাতের বেলা?

অমনি চুপ ঠিকেদার সাহেব।

কী হল! আমি কি মিথ্যে বলছি? ভ্রুকুটি করেন শমীক রায়।

ন্-না স্যার। রেগুলার নয়। ওভ্যেস স্যার।

ওভ্যেসটা বদলান। একটা স্কুল বানাচ্ছেন। চিরদিনের জন্য না পারুন, অন্তত কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখুন।

হ্যাঁ স্যার। আটমোস্ট ট্রাই করব স্যার।

মাথা নাড়েন শমীক রায়। বলেন, ট্রাই ফাই চলবে না। ফের শুনলে সোজা তাড়িয়ে দেব মনে রাখবেন।

রাইট স্যার।

মনে রাখবেন।

হ্যাঁ স্যার। বলেই অপমানে মুখ লাল করে সরে গেলেন পঞ্চাশোর্ধ্ব ঠিকেদার অজয় বিশ্বাস।

সেদিকে তাকিয়ে থুথু ফেললেন শমীক রায়।

ওদিকে মংলা সাঁওতালের বাগানে ডালিয়া ফুটেছে। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের মতো। সূর্যমুখী, কস্‌মস্, গোলাপ। চোখজুড়োনো গাঁদাফুল। হলুদ হয়ে আছে অনেকখানি জায়গা। শীত পড়ছে ক'দিন। গায়ে কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে শমীক রায় যেন মহাভারতে চলে যান। অজয় বিশ্বাসের কাণ্ডটা ভাবতে থাকেন তিনি। লোকটা কী হাড়বজ্জাত। রাত্রি হলেই তার তাঁবুতে মেয়েছেলে আমদানি করে। ভাবতে ভাবতে শমীক রায় নিজেই কীরকম নার্ভাস হয়ে যান। হঠাৎ-ই তিনি তীব্র যৌনতৃষ্ণা অনুভব করেন। এই শীতে ভালোই বেশ জমিয়ে নিয়েছে অজয় বিশ্বাস। ঘাসের ওপরে লোহার ক্যাম্পখাট। স্কচ-হুইস্কি কোত্থেকে বেরিয়ে আসে অন্ধকারের ছোঁয়া পেলেই। কচি মেয়েছেলে। ঠিক ঠিক মাংস চলে আসে। আর শালপাতায় ঢেলে দাঁতে চিবোয় নরম নরম হাড়।

উফ্। থ্রিল আছে ব্যাপারটায়।

গোটা সমাজে সেক্সটা ফ্রি হয়ে গেলে খারাপ হত কি? মোটেও না। মহাভারতের কেষ্টবিষ্টুদের সুবিধে ছিল ভারি। যেখানে খুশি। যেমন খুশি। যাকে খুশি। এইসব ভাবতে ভাবতেই তিনি হাঁক দিলেন, এই যে, কালীবাবু!

স্যার!

শীত পড়েছে। রাতে মাংস হলে ভালো হত। কষানো হবে। ঝাল হবে। আর ইয়ে, ওই যে, 'ফাইল' আনবেন।

হ্যাঁ স্যার।

কালীবাবু চলে যান।

মিক্সচার মেশিনের ঘড়ঘড় আওয়াজ। মিলিটারিদের সাঁজোয়া বহরের মতো মাঝে মাঝে প্রচণ্ড আওয়াজ।

কালীবাবু!

স্যার!